IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

গীতার কর্মযোগ ও কান্টের নীতিতত্ত্ব : একটি তুলনামূলক আলোচনা

Jayanta Bayen

State Aided College Teacher-1, Dept.of Philosophy, Rampurhat College, Birbhum, West Bengal, India

Abstract:

In this world every human being is connected with karma or action. No one can live without action. In the Gita Lord Krishna explained ‘karma Yoga’ when Arjun wanted to exit from the battlefield. The word ‘Karma’ means ‘action’ and ‘yoga’ means generally meditation or some breathing exercise. But in the Gita ‘Yoga’ means the skill of union. According to the Gita ‘Karma Yoga’ refers to all human duties or activities performing without any attachments. Karma Yoga is mainly based on Niskama Karma. Non-attachment action is Niskama Karma, which is done without egoistic attachment to the result thereof. Such Niskama Karma frees us from all bondage and helps us attain God. According to Gita every human being has rights only in action, not in results. So every human being should give up the desire for action’s result.

Immanuel Kant is a famous philosopher in Western ethics. The three main points of his ethics are- the notion of Goodwill, the notion of Duty for duty's sake and the notion of Categorical Imperative. According to Kant, a will that is good in its own quality without conditions is a good will. The act of good will is to act according to the dictates of conscience. Only goodwill is good. According to Kant, every man must be morally completed, not controlled by any motive. Man will act only according to the dictates of his conscience. Which implies duty for duty’s sake in morality. A moral Law is a universal Law that everyone should obey. Such a Law is Categorical Imperative that everyone should obey without any condition. According to Kant, moral action is the doing of duty for duty's sake under the dictates of conscience motivated by Goodwill. In this paper, I have tried to make a comparative discussion between Karma Yoga of Gita and Kant's theory of ethics.

Keywords: Karma Yoga, Niskama Karma, Gita, Good will, Categorical Imperative, Kant, Karma, Duty.

সূচনা: প্রাচ্য নীতিশাস্ত্রে গীতার কর্মযোগের আদর্শ এবং পাশ্চাত্য নীতিশাস্ত্রে কান্টের নীতিতত্ত্ব এক অবিস্মরণীয় কীর্তির সাক্ষর বহন করে। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে মানুষের কর্মের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়। গীতার কর্মযোগ ও কান্টের নীতিতত্ত্বেও কর্মকেন্দ্রিক আলোচনা প্রতিফলিত হয়েছে। এই প্রবন্ধের প্রথমে গীতার কর্মযোগ ও পরে কান্টের নীতিতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে এবং প্রবন্ধের শেষে গীতার কর্মযোগ ও কান্টের নীতিতত্ত্বের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা হলো বিশ্বের এক অদ্বিতীয় গ্রন্থ। গীতা আবহমান কাল ধরে ভারতবর্ষে আদৃত হয়েছে। মহাভারতের ভীষ্মপর্বের সচ্চিদানন্দ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ নিঃসৃত দিব্যবানী হলো শ্রীমদ্ভগবদগীতা। অজ্ঞ জীব যাতে সাংসারিক কর্তব্য কর্ম যথার্থভাবে সম্পাদন করে পরমাত্মাকে লাভ করতে পারে তার উপদেশ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় দিয়েছেন। জীবকে সঠিক পথে চালিত করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ এখানে জ্ঞান,কর্ম ও ভক্তির সমন্বয় সাধন করেছেন। জ্ঞানের দ্বারা যুক্তি সম্ভব ঠিক কিন্তু সেই দুর্গম জ্ঞান মার্গে প্রবেশ করার পূর্বে জীবকে কর্ম ও উপাসনা করতে হয়। জীব প্রতিটি মুহূর্তে কোনো না কোনো কর্মে নিযুক্ত থাকে। কিন্তু সব কর্মের দ্বারা

পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় না, তা নিষ্কাম কর্মের দ্বারা সম্ভব। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রাক্কালে বিভ্রান্ত ও হতাশ অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ যে উপদেশ দিয়েছিলেন তার মধ্যে নিহিত আছে গীতার নিষ্কাম কর্মতত্ত্ব। গীতায় প্রচারিত আদর্শ হলো নিষ্কাম কর্মের আদর্শ।

গীতার কর্মযোগ বা নিষ্কাম কর্ম: 'কর্ম' ও 'যোগ'-এই দুটি শব্দ দ্বারা 'কর্মযোগ' শব্দটি গঠিত হয়েছে। আক্ষরিক অর্থে 'কর্ম' শব্দ দ্বারা 'যা করা হয়' বা একটি কাজকে বোঝায়। 'কর্ম' শব্দ দ্বারা আবার বৈদিক যাগযজ্ঞাদিকেও বোঝায়। মহর্ষি পতঞ্জলির যোগসূত্রে ব্যবহৃত 'যোগ' শব্দটি দ্বারা চিত্ত বৃত্তির নিরোধকে বোঝানো হয়। কিন্তু গীতায় 'যোগ' শব্দটি বিভিন্ন স্থলে নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'যোগ' শব্দটি 'বুদ্ধিযোগ' পদে বুদ্ধিকে আত্মার স্বরূপে কিভাবে যুক্ত করতে হবে তা বলা হয়েছে। এখানে আক্ষরিকভাবে আত্মার স্বরূপের সঙ্গে বুদ্ধির নিয়োগের কথা বলা হলেও অন্য থেকে নিবৃত্তি হওয়ার কথাও সূচিত হয়েছে। কাজেই পতঞ্জলির যোগের সাথে বুদ্ধিযোগের কোন বিরোধ নেই। 'কর্মযোগ' পদে 'যোগ' শব্দটি কিভাবে কর্ম করতে হবে তা বলা হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে 'যোগ' শব্দ দ্বারা কর্মের কৌশলকে বুঝিয়েছেন। 'কৌশল' শব্দের অর্থ নৈপুণ্য। বস্তুতঃ সমত্বই যোগ শব্দের অর্থ। সমত্ববুদ্ধি যুক্ত হয়ে কর্ম করার কৌশলই যোগ। জয়-পরাজয়, লাভ-অলাভ,সুকৃত- দুষ্কৃত প্রভৃতি সমান জ্ঞান করে কর্মের অনুষ্ঠানের নাম 'কর্মযোগ'। কর্মযোগে যোগ বলতে সমত্ববুদ্ধিকে বোঝালেও অন্য থেকে নিবৃত্তির কথাও সূচিত হয়েছে।

কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে মিত্র পক্ষ ও শত্রুপক্ষের মধ্যে অন্তরঙ্গ আত্মীয়-স্বজন, আচার্যবর্গ এবং বন্ধু-বান্ধবগণকে সম্মুখে দেখে এবং মহাযুদ্ধে তাদের আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায় শোকে ও পাপের ভয়ে অর্জুন যুদ্ধ পরিত্যাগ করার সঙ্কল্প ও সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কর্মে প্রেরণ করার জন্য বলেছেন-

'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি'[1]**।।**

অর্থাৎ হে অর্জুন কর্মেই তোমার অধিকার,কর্মফলে কখনো অধিকার নেই। সুতরাং কর্মফল যেন তোমার কর্ম প্রবৃত্তির হেতু না হয় এবং কর্মত্যাগেও যেন তোমার আসক্তি না হয়। শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশের মাধ্যমে নিষ্কামকর্ম প্রতিফলিত হয়েছে। শরণাগত অর্জুনকে এই উপদেশের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত মানুষকে উপদেশ দিয়েছেন। সমগ্র গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নানাভাবে তত্ত্বটিকে ব্যাখ্যা ও প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই তত্ত্ব সব মানুষের কাছে সমানভাবে অনুসরণীয় এবং এই তত্ত্ব অনুসরণের মাধ্যমে সমগ্রজীবের কল্যাণ সাধন সম্ভব হতে পারে। বর্ণ,আশ্রম, স্বভাব ও পরিস্থিতি অনুসারে প্রত্যেক মানুষের নিজ কর্মকর্তব্য থাকে। মানুষ সেই কর্ম অবশ্যই করবে কারণ সেই কর্মের প্রতি তার অধিকার আছে। কিন্তু কর্মের ফলের উপর মানুষের কোন অধিকার নেই। কর্মফল ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেকটি মানুষের কর্মফলের কথা চিন্তা না করে নিষ্কাম ভাবে কর্ম সম্পাদন করা উচিত। কিন্তু নিষ্কাম ভাবে বা ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে কিভাবে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া যায় সে বিষয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন-

'যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে'[2]**।।**

শ্রীকৃষ্ণ উপরোক্ত উপদেশের মাধ্যমে অর্জনকে সমত্ব বুদ্ধিতে কর্ম সম্পাদনের উপদেশ দিয়েছেন। হে ধনঞ্জয় (অর্জুন) তুমি ফলাসক্তি বর্জন করে, সিদ্ধি- অসিদ্ধিকে সমান জ্ঞান করে, যুগস্থ হয়ে কর্ম করো। এমন কর্মই প্রকৃষ্ট কর্ম-নিষ্কাম কর্ম।কর্ম সিদ্ধি হলে মানুষ যেমন পরম আনন্দ লাভ করে তেমনি আবার কর্মের অসিদ্ধিতে বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তাই যদি কর্মের সিদ্ধি-অসিদ্ধির মধ্যে সমত্ব বজায় রাখা যায় তবে অনায়াসে কর্মফলের আসক্তি দূর হবে। নিষ্কাম কর্মযোগে স্থিত হয়ে কর্ম করা অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জনপূর্বক সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমত্ববুদ্ধি হয়ে কর্ম করা, একেই গীতায় 'কর্মযোগ' বলা হয়েছে। কর্মযোগের মূল তিনটি লক্ষণ হল-১) ফলাাকাঙ্ক্ষা বর্জন, ২) কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ এবং ৩) ঈশ্বরে সর্বকর্ম সমর্পণ। ব্যক্তিকে কামনা ও কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করে নিজে বুদ্ধিকে ঈশ্বরে নিহিত করে একনিষ্ঠ চিত্তে নিষ্কামভাবে কর্মসম্পাদন করা কর্তব্য। স্বার্থ চিন্তা ত্যাগ করে, ঈশ্বরের প্রীতির জন্য, জীবের মঙ্গলের জন্য কৃতকর্মই যজ্ঞ। যজ্ঞের মধ্যে ত্যাগের মনোভাব নিহিত। যজ্ঞ কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে আমিত্ব ত্যাগ করতে হয়। এরূপ যজ্ঞবুদ্ধিতে কৃতকর্মই নিষ্কাম কর্ম। এ প্রসঙ্গে গীতায় তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে-

'যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ।

তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর'[3]।।

অর্থাৎ 'যজ্ঞের উদ্দেশ্যে বা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে করা কর্ম গুলি ব্যতীত কোন কর্ম করলে মানুষ তাতে বন্ধন প্রাপ্ত হয়। তাই অর্জুন তুমি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আসক্তি বর্জিত হয়ে কর্ম করো'। মানুষ কর্ম করলে বন্ধনে আবদ্ধ হয় না, আবদ্ধ হয় নিজের জন্য কর্ম করলে। মানুষ কর্ম বন্ধন থেকে তখনই মুক্ত হতে সক্ষম হয় যখন সে জগত সংসার থেকে প্রাপ্ত শরীর,বস্তু,যোগ্যতা ও সামর্থ্য জগতেরই সেবায় নিয়োজিত করে এবং তার পরিবর্তে কোন কিছু আশা করে না। সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার জন্য আমাদের উচিত সংসার থেকে প্রাপ্ত বস্তু সংসারের সেবাতেই নিয়োগ করা। এমনভাবে কর্ম করা প্রত্যেক মানুষের উচিত।

কোন মানুষ ক্ষণকালও কর্ম ব্যতীত থাকতে পারে না। তাই গীতায় বলা হয়েছে-

'ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।

কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ'[4]।।

উপরোক্ত শ্লোকের মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একথা বলছেন যে, 'কোন ব্যক্তি কর্মবিহীন হয়ে থাকতে পারবে না। খাওয়া, বসা,শয়ন,জাগরণ, চিন্তন ধ্যান করা- ইত্যাদি কর্মের অন্তর্গত। প্রকৃতিজাত গুণের দ্বারা বশীভূত হয়ে প্রাণী কর্ম করতে বাধ্য হয়'। যতক্ষণ শরীর থাকবে নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী জীব কোন না কোন কর্মের সাথে যুক্ত থাকবে। সুতরাং যতক্ষণ প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক থাকে, ততক্ষণ মানুষ কোন অবস্থাতেই এক মুহূর্তেও কর্ম রহিত অবস্থায় থাকতে পারে না,সর্বদা কর্ম করে যেতে হয়।

কর্মত্যাগ করা অপেক্ষা, কর্মানুষ্ঠান শ্রেষ্ঠ। এ প্রসঙ্গে গীতায় বলা হয়েছে-

'কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।

লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি'[5]।।

অর্থাৎ 'রাজা জনকের মত মহাত্মাগণ কর্ম দ্বারাই পরম সিদ্ধি লাভ করেছেন। তাই লোকসংগ্রহের দিকে দৃষ্টি রেখে তোমারও নিষ্কাম ভাবে কর্ম করা উচিত'। এই শ্লোকটিতে শ্রীকৃষ্ণ জনকাদি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে প্রতিপাদন করেন যে, কর্ম ত্যাগ পূর্বক সন্ন্যাস অবলম্বন অপেক্ষা সংসারে অবস্থান করে কর্ম অনুষ্ঠান উত্তম। মিথিলার রাজা জনকের মত আত্মজ্ঞানী রাজর্ষিগণ আত্মজ্ঞান লাভ করেও তারা যথাবিহিত কর্তব্যকর্ম থেকে বিচ্যুত হননি। তারা স্বধর্ম অনুসারে কর্তব্য কর্মের পথ ধরেই মোক্ষ লাভ করেছেন। সুতরাং জনকাদি মাহাত্ম্যাদের পথ অনুসরণ করে কর্মানুষ্ঠান করা উচিত। গীতায় আরো বলা হয়েছে যে, লোকসংগ্রহের জন্য অর্থাৎ সৃষ্টি রক্ষার জন্য কর্ম অনুষ্ঠান প্রয়োজন, যারা সমাজের শীর্ষস্থানীয় তাদেরকে অন্যরা অনুসরণ করে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা কর্ম না করলে অন্যরা কর্ম থেকে বিরত থাকে। ফলে মানব সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন যে, ত্রিভুবনের মধ্যে তার অপ্রাপ্ত কিছু না থাকলেও অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করে ধর্ম সংস্থাপনের জন্য কর্ম করছেন। ভগবান কর্মের অতীত, তার পক্ষে কর্ম করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্ম না করলে সাধারণ মানুষও কর্ম করবে না। তাই লোকহিতার্থের জন্য ভগবানকেও কর্ম করতে হয়। অর্জুনকে মাধ্যমরূপে গ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত মানুষকে এক কথাই বলেছেন যে, সমাজের হিতার্থে মানবজাতির কল্যাণ সাধনের জন্য আত্মজ্ঞানে বলীয়ান হয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে, কামনাশূন্য ভাবে কর্ম কর। এমন কর্মেই পরম প্রাপ্তি। তাই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন-

'ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সন্ন্যস্যাধ্যাত্মচেতনা।

নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ'[6]।।

অর্থাৎ 'তুমি বিবেক বুদ্ধি সহকারে তোমার সমস্ত কর্ম আমাকে অর্পণ করে নিষ্কাম, মমতাশূন্য ও শোকশূন্য হয়ে যুদ্ধ রূপ কর্তব্যকর্ম কর'। এখানে শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিয়েছেন যে,সম্পূর্ণভাবে ভগবৎ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কর্তব্য কর্ম করতে হবে। প্রত্যেকেরই নিজস্ব গুণ অবস্থা অনুসারে এক বিশেষ কর্তব্য কর্ম আছে। সেই কর্তব্যকর্ম করা উচিত, কারণ তাতেই মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়। নিষ্কাম কর্মযোগের তিনটি লক্ষণ- ১) ফলাকাঙ্ক্ষা

বর্জন- 'নিরাশী' শব্দ দ্বারা তাহাই কথিত হইল, ২) কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ -'অধ্যাত্মচেতসা'ও 'নির্মম' শব্দ দ্বারা তাহাই বলা হইয়াছে, 'আমি, 'আমার' জ্ঞান থাকলে নির্মম হওয়া যায় না, চিত্তও আত্মসংস্থা হয় না, ৩) সর্বকর্ম ঈশ্বর সমর্পণ(ময়ি= আমাতে অর্থাৎ পরমেশ্বরে); এই শ্লোকে এই তিনটি লক্ষণই নির্দেশ করা হইল। যিনি সর্বকর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ-পূর্বক 'আমি তাঁহার ভৃত্য স্বরূপ কর্ম করিতেছি'- এই জ্ঞানে কর্ম করেন, তিনি পরম ভক্ত, সুতরাং কর্মযোগই ভক্তিযোগ। যিনি চিত্তকে আত্মসংস্থা করিয়াছেন, 'আমি' 'আমার' জ্ঞান ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, তিনি পরম জ্ঞানী, সুতরাং কর্মযোগই জ্ঞানযোগ, এইরূপভাবে যিনি সর্ব কর্ম অর্থাৎ যুদ্ধাদি লোকিক কর্ম ও পূজার্চনা, দান-তপস্যাদি বৈদিক বা শাস্ত্রীয় কর্ম সম্পন্ন করেন, তিনিই প্রকৃত কর্মী, ইহাই কর্মযোগ। সুতরাং ইহাতে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি তিনের সমন্বয়।[7]

আমরা কর্মযোগের ব্যাখ্যায় দেখি যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন, কর্মেই তোমার অধিকার, কর্মফলে নয়, ফল লাভের আকাঙ্ক্ষা যেন তোমার কর্মের প্রবর্তক না হয় এবং কর্ম না করার প্রবৃত্তি যেন তোমার না হয়। এইভাবে গীতায় কর্মযোগের চতুঃসূত্র বর্ণিত হয়েছে-১) কর্ম করাতেই তোমার অধিকার, ২) ফলে তোমার কোন অধিকার নেই,৩) তুমি কর্মফলের হেতুও হয়ো না এবং ৪) কর্মরহিত হওয়াতে যেন তোমার আসক্তি না হয়[৮]।

উপরোক্ত কথাগুলি হল গীতার কর্মযোগের মূল ভিত্তি। এসব কথার মাধ্যমে এটাই বলা হয় যে, মানুষের কর্মাদি নৈতিক বিচারের মানদন্ড, কর্মাদির বাহ্যফল বা পরিনাম নয়,তা হল কর্মকর্তার নিষ্কামবুদ্ধি। সমত্ববুদ্ধিতে, লাভ- লাভের হিসাব না করে কেবল কর্তব্যের খাতিরে কর্মটি সম্পাদিত হলে তা হবে 'ভালো' কর্ম, না হলে 'মন্দ' কর্ম। একেই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'যোগস্থঃ করু কর্মাণি'।

নিষ্কাম কর্মের ব্যাখ্যায় গীতায় কর্ম ত্যাগের কথা বলা হয়নি, বলা হয়েছে কর্মফল ত্যাগের কথা, কর্মফলে অনাসক্তির কথা। ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে কর্ম করার তুলনায় কর্ম ত্যাগ করা অনেক সহজ। কিন্তু গীতায় কর্মহীনতাকে অনুমোদন করা হয়নি। আসলে মানুষের পক্ষে কর্ম থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব নয়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন, কর্ম ব্যতীত দেহযাত্রাও নির্বাহিত হয় না। কর্ম না করে কেউ থাকতে পারে না। সুতরাং কর্ম ত্যাগ অসম্ভব। তাই গীতায় কর্মের বাহ্যিক ত্যাগের উপদেশ দেওয়া হয়নি, ফলত্যাগের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এইভাবে গীতার নিষ্কাম নীতিতত্ত্বে স্বার্থশূন্য আসক্তিহীনতার বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। এখন আমরা কান্টের নীতিতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করবো।

কান্টের নীতিতত্ত্ব: নৈতিকতার ইতিহাসে ইমানুয়েল কান্ট আধুনিক যুগের একজন প্রভাবশালী বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক। কান্ট নীতিদর্শনে যে নীতিতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন তা 'বিচারবাদ' বা 'কৃচ্ছতাবাদ' নামে পরিচিত । কান্টের মতে, মানুষের দু- ধরনের বৃত্তি আছে - একটা হল ইন্দ্রিয় বৃত্তি এবং অন্যটি হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তি। মানুষের ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিম্নতরের বৃত্তি, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি হচ্ছে উচ্চ স্তরের বৃত্তি। ইন্দ্রিয়বৃত্তির দিক দিয়ে মানুষ পশুর সমকক্ষ এবং সুখ লাভকেই জীবনের আদর্শ বলে মনে করে। অপরদিকে বুদ্ধিযুক্ত জীব হিসাবে মানুষ ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তিকে অবদমন করে বুদ্ধির মাধ্যমে পরিচালিত হতে চায়। কান্ট তার 'Groundwork of Metaphysic of Morals' নামক গ্রন্থে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি দুটি দিকের কথা বলেছেন- বিশুদ্ধ বুদ্ধি (Pure Reason) এবং ব্যবহারিক বুদ্ধি (Practical Reason) । জ্ঞান-বিদ্যা ও অধিবিদ্যা বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা আলোচিত হয় এবং ব্যবহারিক বুদ্ধির দ্বারা নৈতিক নিয়ম প্রতিষ্ঠা করা হয় । কান্টের নৈতিক মতবাদ যে তিনটি মূল ধারণাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে সেগুলি হলো যথা-

১) সদিচ্ছা সম্পর্কিত ধারণা

২) শর্তহীন আদেশ সম্পর্কিত ধারণা এবং

৩) কর্তব্যের জন্য কর্তব্যের ধারণা

উপরোক্ত তিনটি ধারণা আলোচনার মাধ্যমে আমরা কান্টের নৈতিক অভিমত তুলে ধরার চেষ্টা করব।

১) সদিচ্ছা সম্পর্কিত ধারণা (Notion of Good will) : কান্টের মতে, একমাত্র সদিচ্ছায় ভালো। কান্টের ভাষায়, " It is impossible to conceive anything at all in the world, or even out it, which can be taken without qualification except a good will."[9] অর্থাৎ 'সদিচ্ছা ব্যতীত এই জগতে, এমন কি এই জগতের বাইরেও কোন কিছু কল্পনা করা যায় না, যাকে বিনা শর্তে ভালো হিসাবে নেওয়া যেতে পারে'। কান্টের মতে, যে ইচ্ছা শর্ত

ছাড়াই নিজস্ব গুণে ভালো সে ইচ্ছাই হচ্ছে সদিচ্ছা। সদিচ্ছায় কেবল শর্তহীন ভাবে ভালো, আর বাকি সবই শর্ত যুক্তভাবে ভালো। সদিচ্ছা স্বতোমূল্যবান, যেকোনো পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে নিঃশর্তভাবে শুভ। সদিচ্ছার সঙ্গে যদি কিছু যোগ নাও থাকে, সদিচ্ছার সঙ্গে যদি আশানুরূপ ফলের যোগ নাও থাকে, তাও ওই সদিচ্ছা সদিচ্ছা হিসাবেই বিদ্যমান। এটাই একমাত্র প্রকৃত কল্যাণকর। উজ্জ্বল রত্নের ন্যায় তা নিজের দীপ্তিতেই দিপ্যমান। তাই বলা হয় যে, সদিচ্ছার শুভত্ব অন্যনিরপেক্ষ এবং সম্পূর্ণ স্বকীয়। এজন্যই কান্ট সদিচ্ছাকে স্বতোমূল্যবান বলে গণ্য করেছে।

কান্ট বলেন যে, কোন কাজ যখন সদিচ্ছার দ্বারা উজ্জীবিত হয়ে করা হয় তখন সে কাজকে ভালো কাজ বলা হয়। কিন্তু কোন কাজ যদি মন্দ ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে করা হয় তখন আর সে কাজকে ভালো কাজ বলা হয় না, বরং কাজটি মন্দ বলে গণ্য হতে বাধ্য হয়। তিনি এ কথা দ্বারা বোঝাতে চাননি যে, মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে সদিচ্ছা ছাড়া অন্যান্য যে সকল গুণগুলো আছে যেমন-বুদ্ধি, সচেতনতা, সৎগুন, নৈতিক অগ্রগতি অর্জনের অদম্য স্পৃহা প্রভৃতি ধারণা সমূহ ভালো ও কাম্য নয়। কান্টের মতে, এগুলো কেবলমাত্র তখনই ভালো ও কাম্য বলে গণ্য হতে পারে যখন এগুলি সদিচ্ছা প্রণোদিত হয়ে সম্পন্ন করা হয়। কান্টের মতে, সদিচ্ছা যখন বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয় তখনই সেই ইচ্ছা সদিচ্ছা বলে গণ্য হয় এবং যে ইচ্ছা বুদ্ধির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয় সেই ইচ্ছা সদিচ্ছা বলে পরিগণিত হয় না। অর্থাৎ কান্টের মতে, কোন ইচ্ছাকে সদিচ্ছা প্রসূত হতে হলে তাকে বুদ্ধির দ্বারা অবশ্যই পরিচালিত ও সমর্থিত হওয়া প্রয়োজন।

কান্টের মতে, যে ইচ্ছা কর্তব্যবুদ্ধির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কোন নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন করে, তাকে বলা হয় স্বাধীন ইচ্ছা (Autonomy of will) এবং মানুষের যে ইচ্ছা কর্তব্যবুদ্ধির দ্বারা অনুপ্রাণিত না হয়ে, আবেগ-অনুভূতি দ্বারা পরিচালিত হয়ে কর্ম সম্পাদন করে, তাকে বলা হয় পরাধীন ইচ্ছা (Heteronomy of will)। কান্টের মতে,সদিচ্ছা প্রণোদিত স্বাধীন কর্মই কেবল নৈতিক কর্ম। প্রকৃতপক্ষে সদিচ্ছা কর্তব্যবোধের সঙ্গে সর্বদা যুক্ত বলেই তা স্বাধীন এবং তা নিজস্ব মূল্যেই মঙ্গলজনক।

২) নিঃশর্ত অনুজ্ঞা বা আদেশ (Notion of Categorical imperative) : কান্টের নীতিশাস্ত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় হল 'নিঃশর্ত আদেশ বা অনুজ্ঞা'। কান্টের মতে, যখন কোন বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের ইচ্ছা বা কর্মপ্রয়াস বাধ্যতামূলক নিয়ম-নিষ্ঠ নীতির দ্বারা নির্দিষ্ট হয় এবং ঐ নীতির দ্বারা বিচারবুদ্ধির যে নির্দেশ প্রকাশিত হয় তাকেই শর্তহীন আদেশ বা অনুজ্ঞা বলা হয়। অর্থাৎ আমাদের বিবেক যে নৈতিক নিয়ম আমাদের সামনে প্রস্তুত করে তাই হলো শর্তহীন আদেশ। এ আদেশ হলো বিবেকের আদেশ, যা আমাদের উচ্চবৃত্তি ব্যবহারিক বুদ্ধি আমাদেরই নিম্নবৃত্তির উপর প্রয়োগ করে। নৈতিক নিয়ম বাইরে থেকে চাপানো কোন আদেশ নয়, এটি স্বতঃআরোপিত । মানুষেরই আদেশ মানুষের উপর আরোপিত হয়, নৈতিক নিয়ম পালনে তাই সকল মানুষ বাধ্য থাকে। এজন্যই কান্ট নৈতিক নিয়মকে নিঃশর্ত আদেশ বা অনুজ্ঞা বলেছেন। প্রশ্ন ওঠে যে, কেউ যদি নিয়মটি পালন করতে সক্ষম না হই? উত্তর প্রসঙ্গে কান্ট বলেন , 'তোমার করা উচিত মানে তুমি করতে পারো'(Thou oughtest means than can't)। কান্টের মতে, নৈতিক নিয়ম হল এমনই এক ধরনের নিঃশর্ত আদেশ যা মনুষ্যজাতির অন্তর্গত সব মানুষের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য।

কান্টের শর্তহীন আদেশের স্বরূপ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেতে গেলে কান্ট আরও যেসব আদেশের কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলিকে জানা আবশ্যক, যেমন-

শর্তাধীন আদেশ (Conditional Imperative): যে আদেশ এক বিশেষ শ্রেণির মানুষ কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পালন করে, সকলে নয়, সে আদেশকে বলা হয় শর্তাধীন আদেশ। যেমন -স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম, কেননা যে সুস্বাস্থ্য চাই তাকে অবশ্যই নিয়মটি পালন করতে হয়,আর নিয়মটিকে না পালন করলে উদ্দেশ্য সাধন হয় না।

দৃঢ় উক্তিমূলক আদেশ (Assertorical Imperative): যে আদেশের ক্ষেত্রে প্রত্যেক বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন কর্মকর্তা উদ্দেশ্যটিকে নিজের স্বভাব বশতঃ পেতে চায়, যেগুলি কোন সর্বজন কাম্য উদ্দেশ্যের জন্য, সেই আদেশ হল দৃঢ় উক্তিমূলক আদেশ।এই আদেশ মূলত শর্তাধীন,কেননা, তা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য লাভের জন্য পালন করা হয়। যেমন- 'সুখলাভের আদেশ'। মানুষকে সুখলাভ করতে হলে 'সুখসূত্র'- এর আদেশকে পালন করতে হয়। তবে কান্টের মতে,ফলমুখী কোন আদেশ সর্বজন আদৃত হতে পারে না।

উপরোক্ত দু প্রকার আদেশ থেকে কান্টের শর্তহীন আদেশ সম্পূর্ণ পৃথক। এরূপ আদেশের ক্ষেত্রে কোন শর্ত থাকে না, এগুলি শর্তহীনভাবে পালনীয়। নিঃশর্ত আদেশের ক্ষেত্রে কর্মের পরিণাম যাই হোক না কেন, তার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে কর্মটিকে কেবল কর্তব্য হিসেবেই সম্পাদন করা হয়। এই ধরনের আদেশকে আবশ্যিক বা অনিবার্য আদেশও বলা হয়। এই জাতীয় আদেশ যে কর্ম করার কথা বলে সেই সব কর্ম নৈতিকতার দিক থেকে স্বয়ং মঙ্গলজনক। কান্টের মতে, নৈতিক নিয়ম হল এমনই শর্তহীন পর্যায়ভুক্ত যা আমরা সর্বদা পালন করতে বাধ্য থাকি।

কান্ট নৈতিকতার সর্বোচ্চ নীতি নিঃশর্ত আদেশকে নিম্নোক্ত কয়েকটি বয়ানে প্রকাশ করেছেন-

প্রথম বয়ান: "এমন একটি নীতি অনুসারে কাজ করো, যে নীতিকে তুমি সার্বজনীন নিয়মরূপে সংকল্প করতে পারো" ("Act only on that maxim through which you can at the same time will that it should become a universal law."[10]) এই বয়ান দ্বারা ব্যক্ত হয় যে, যেসব নীতি আমাদের ইচ্ছার অন্তর্নিহিত নিয়ম হিসাবে কাজ করে, সেই সব নীতিকে সার্বিক নিয়মের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। সমাজে প্রচলিত কোন নিয়মের ক্ষেত্রে যদি সার্বিক নীতিকে প্রয়োগ করা যায় তাহলে তা নৈতিক, আর প্রয়োগ করার না গেলে তা অনৈতিক।

দ্বিতীয় বয়ান: "এমনভাবে কাজ করো যাতে তুমি নিজেকে অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে উপায় রূপে নয়, সর্বদা উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য রূপে ব্যবহার করতে পারো"। ("Act in such a way that you always treat humanity, whether in your own person or in the person of any other, never simply as a means, but always at the same time as an end. "[11]) কান্টের দ্বিতীয় বয়ানে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই নিজের লক্ষ্য, কোন ব্যক্তিকে লক্ষ্যসিদ্ধির উপায় হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়। নিজেকে অথবা অপর ব্যক্তিকে সর্বদা উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করা কর্তব্য।

তৃতীয় বয়ান: 'এমন ভাবে তুমি কাজ করো যাতে তুমি উদ্দেশ্য রাজ্যের একজন বিধি রচনাকারী সদস্য হিসাবে গণ্য হতে পারো'। কান্টের মতে, প্রতিটি বুদ্ধিমান সত্তার স্বতন্ত্র অথা নিজস্ব মূল্য আছে। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই নিজের লক্ষ্য এবং নৈতিক ও আদর্শ সমাজের সকল ব্যক্তি একই সঙ্গে রাজা ও প্রজা স্বরূপ। ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্যবোধই ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়। কান্টের মতে, নৈতিকতার একমাত্র লক্ষ্য এটাই হওয়া আবশ্যক।

৩) কর্তব্যের জন্য কর্তব্যের ধারণা (Notion of Duty for Duty's sake) : কান্টের নীতিতত্ত্বের আরো একটা উল্লেখযোগ্য ধারণা হলো- 'কর্তব্যের জন্য কর্তব্যে' -এর ধারণা। কান্টের মতে, বিচার বোধের নিয়মই প্রকৃতপক্ষে কর্তব্যের নিয়ম। বিচার বুদ্ধির দ্বারা প্রত্যেক মানুষের উচিত প্রতিটি কাজ কর্তব্যের জন্য কর্তব্য হিসেবে সম্পন্ন করা। কোন প্রকার ফলাফল বা পরিস্থিতির বিচার নয়। কর্তব্য কর্মে অগ্রসর হওয়ার সময় ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন আবশ্যক, কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের মোহে নয়, অনুভূতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নয়, কেবলমাত্র কর্মটিকে কর্তব্য ভেবেই সম্পাদন করতে হবে। এই রূপ ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জিত কর্তব্য সম্পাদনই হচ্ছে কান্টের দৃষ্টিতে 'কর্তব্যের জন্য কর্তব্য'। কান্ট বলেন যে, একটি কাজ সদিচ্ছা প্রণোদিত বলা তখনই সঙ্গত হয় যখন কাজটি কর্তব্যবোধের দ্বারা উজ্জীবিত হয়ে সম্পন্ন করা হয়। শুধুমাত্র অনুভূতি, অদম্য বাসনা, প্রেষণা, প্রত্যাশিত ফলাফল লাভের ইচ্ছা প্রভৃতি দ্বারা প্রণোদিত হয়ে কোন কাজ করা হলেই যে সে কাজে নৈতিক মূল্য আছে তা বলা যুক্তিযুক্ত হবে না। কান্টের মতে, সদিচ্ছা প্রণোদিত হয়ে বিবেকের নির্দেশে কর্তব্য সাধনই নৈতিক কর্ম।

কান্টের কর্তব্য নীতিতে দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রেম, করুণা, সহানুভূতি ইত্যাদির কোন স্থান নেই। কান্টের মতে,প্রকৃত কর্তব্য হলো বুদ্ধি প্রসূত। কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা দয়া-ময়া,করুণা ইত্যাদি দ্বারা পরিচালিত হয়ে অনেক কর্ম করি, যেমন-ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিয়ে সাহায্য করি, আশ্রয়হীনকে আশ্রয় দিই ইত্যাদি। এই জাতীয় কর্মের কান্টের মতে, কোন নৈতিক মূল্য নেই। এসব কাজকে তিনি 'বিকারগ্রস্ত কাজ' বলেছেন। এ জাতীয় কাজের ক্ষেত্রে বিবেকের কোন নির্দেশ থাকে না। এজাতীয় কর্ম যুক্তিহীন। সুতরাং বলা যায়, কোন কর্মের ন্যায়পরতা যেমন তার ফলাফলের উপর নির্ভর করে না, তেমনি কোন অনুভূতি বা আবেগের উপরও নির্ভরশীল নয়। কান্টের নীতিতত্ত্বানুসারে, একটি কর্মকে নৈতিক দৃষ্টিতে শুভ বলা যায়, যদি সেটি কোন তাৎক্ষণিক প্রবণতা বসতঃ অনুষ্ঠিত না হয়ে, কেবল কর্তব্যবোধের প্রেরণায় সম্পাদিত হয়।

গীতার কর্মযোগ ও কান্টের নীতিতত্ত্বের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য: গীতার কর্মযোগ ও কান্টের নৈতিক মতবাদের আলোচনার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে, উভয় মতবাদের মধ্যে যেমন সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় তেমনি আবার অমিল বা বৈসাদৃশ্যও পরিলক্ষিত হয়। এগুলি নিম্নে তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো।

সাদৃশ্য বা মিল: ১) গীতার কর্মযোগ ও কান্টের নীতিতত্ত্ব উভয়ই কর্মের উপর জোর দেয়। উভয়ই মতে, কর্মকে নৈতিক জীবনের জন্য উপাসনা করা উচিত। কান্টের মতে, আমরা যদি কর্মের খাতিরে ক্রিয়া করি তবে আমাদের কর্মগুলি নৈতিক কর্ম হিসেবে গণ্য হতে পারে। অন্যদিকে গীতাতেও বলা হয়, আমাদের কেবল কর্ম করার অধিকার আছে। নৈতিক জীবন যাপনের জন্য আমাদের নৈতিক কর্ম করা উচিত। যদি আমরা কান্টের বা গীতার নৈতিক কর্মকে গ্রহণ করি তবে অতি সহজেই একটি নৈতিক জীবন যাপন করতে পারি। ২) গীতার কর্মযোগ ও কান্টের নৈতিক মতবাদে ফলমুখী নৈতিকতাকে বর্জন করে কর্তব্যমুখী নৈতিকতাকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গীতাতে বলা হয়েছে, প্রত্যেক মানুষের উচিত ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন করে, কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করে, নিষ্কাম কর্মযোগে স্থিত হয়ে কর্ম সম্পাদন করা। কান্টও তাঁর নৈতিক মতবাদে ফলের কথা ত্যাগ করে শুধুমাত্র সদিচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হয়ে কর্ম সম্পাদন করার উপদেশ দিয়েছে। তাঁর মতে, সদিচ্ছা সঙ্গে যদি প্রত্যাশিত ফলের যোগ নাও থাকে তাও তা নিজে গুণে ভালো। ৩) গীতা মতে, মানুষ যখন প্রকৃতির দ্বারা পরিচালিত হয় তখন সে পরাধীন এবং আত্মজ্ঞানের দ্বারা মানুষ যখন নিজের স্বরূপ লাভ করে তখন সে স্বাধীন। এরূপ আত্মবান ব্যক্তি নিষ্কামভাবে কর্ম করেন জগতের মঙ্গল সাধনের জন্য। কান্টও তাঁর নীতিতত্ত্বে ইচ্ছার স্বাধীনতা ও ইচ্ছার পরাধীনতার কথা উল্লেখ করেছেন। কান্টের মতে, যে ইচ্ছা কর্তব্য বুদ্ধির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কর্ম করে তা হল স্বাধীন ইচ্ছা এবং যে ইচ্ছা আবেগ-অনুভূতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে কর্ম করে তাহলে পরাধীন ইচ্ছা এবং ৪) গীতায় মানুষের মধ্যে নিম্নতর পশুসত্তা ও উচ্চতর দেবসত্তা কথা যেমন বলা হয়েছে ঠিক কান্টও তাঁর নৈতিক মতবাদে অনুরূপ অভিমত পোষণ করেছেন। গীতায় নিম্নতর পশু সত্তাকে উচ্চতর দেবসত্তার দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সংযমের কথা ঘোষিত হয়েছে। কান্টও বলেন যে, মানুষের মধ্যে পশুর মতো জৈব প্রবৃত্তি বিদ্যমান এবং মানুষের উচ্চতর বুদ্ধির দ্বারা নিম্নতর পশু প্রবৃত্তিকে সংযত করা উচিত।

বৈসাদৃশ্য বা অমিল: ১) গীতার নিষ্কাম কর্মযোগ ও কান্টের নৈতিক অভিমতের মধ্যে অমিল হল- নৈতিক কর্মের প্রকৃতি সম্পর্কে। কান্টের মতে, কেবলমাত্র কর্তব্যের জন্য কোন কাজ করা হলে তা নৈতিক কর্ম বলে গণ্য হবে। কোন কিছু পাওয়ার আশায় কোন কর্ম সম্পাদিত হলে তা নৈতিক কর্ম বলে বিবেচিত হবে না। অন্যদিকে গীতায়, যদি লোকসংগ্রহের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কোন কর্ম সম্পাদিত হয় তবে তা নৈতিক কর্ম হিসাবে মর্যাদা পাবে। শ্রীমদ্ভগবদগীতা আমাদের শুধু কর্তব্যের জন্য কর্ম করার উপদেশ দেন না। কোন কর্ম যদি তার ফলাফলের প্রতি কোন অহংকার ছাড়াই করা হয় তবে তা নৈতিক কর্ম বলে গ্রহণযোগ্য হবে। ২) গীতার নিষ্কাম কর্মযোগে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের এক সুন্দর সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। পক্ষান্তরে কান্টের নীতিতত্ত্বে নিষ্কাম কর্মের ও বুদ্ধির উল্লেখ থাকলেও কিন্তু ভক্তির কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। সেখানে কর্তব্যবুদ্ধিতে কর্তব্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ঈশ্বর ভক্তির কোন ভূমিকা নেই। এখানেও উভয়ের মধ্যে প্রভেদ দৃষ্ট হয়। ৩) কান্টের 'কর্তব্যের জন্য কর্তব্য' নীতিতে এক প্রকার স্বার্থবোধের মনোভাব বিদ্যমান, কেননা কান্ট সৎকর্মের সঙ্গে সুখের সামঞ্জস্য বিধানের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অন্যদিকে নিষ্কাম কর্মে স্বার্থবোধের মনোভাবটি একবারেই অনুপস্থিত। গীতোক্ত কর্মযোগী এ সকলের ঊর্ধে। ৪) কান্টের নীতিতত্ত্বের মৌলিক উৎস হল বিবেকের প্রেরণা ও নির্দেশ। যার মধ্যে এক ধরনের বাধ্যবাধকতার ভাব নিহিত আছে। অন্যদিকে গীতায় নিষ্কাম কর্মের মধ্যে কোন বাধ্যবাধকতার ভাব নেই। অন্তরে স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং ৫) শ্রীমদ্ভগবতগীতায় মোক্ষ হল সর্বোচ্চ কল্যাণ, মোক্ষে পরমসত্তার সংস্পর্শে একজন ব্যক্তি অসীম আনন্দ পেতে পারে। আমাদের চূড়ান্ত পরিণতি পাওয়ার জন্য আমাদের কর্ম করা অবশ্যক, যা মোক্ষ ব্যতীত কোন কিছু হতে পারে না। পক্ষান্তরে কান্টের মতে, সর্বোচ্চ ভালো হলো সদিচ্ছা। সদিচ্ছা নিঃশর্তভাবে ভালো। এর কল্যান কোন প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভরশীল নয়। এটির অন্তর্নিহিত মূল্য বিদ্যমান। উল্লেখ্য যে, সদিচ্ছা ও কর্তব্যের মধ্যে কোন আবশ্যিক সংযোগ নেয় এবং এটি পরিপূর্ণ কল্যাণ থেকেও আলাদা। কান্টের নীতিশাস্ত্রে সর্বোচ্চ ভালো থেকে ভালো ইচ্ছাও পৃথক। কান্টের নীতিতত্ত্বে সদগুণ হলো পরম কল্যাণ।

উপসংহারঃ সমগ্র আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, গীতার নিষ্কাম কর্মযোগ ও কান্টের নীতিতত্ত্বের মধ্যে যে মিল বা সাদৃশ্য বিদ্যমান তা আপেক্ষিক রূপে গ্রহণযোগ্য। কখনোই সার্বিকভাবে

গ্রহণযোগ্য নয়। উভয়ের মধ্যে কিছুটা মিল থাকলেও তা এতটা ন্যূনতম যে, এর পরিপ্রেক্ষিতে কোন তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। গীতার কর্মযোগ ও কান্টের নীতি তত্ত্বকে এক সিংহাসনে বসানো যায় না। কান্টের নীতিতত্ত্ব অপেক্ষা গীতার নিষ্কাম কর্মের বিষয়টি আরও অনেক উচ্চ আদর্শগত নৈতিকতার আসনে অধিষ্ঠিত। তাই পরিশেষে বলতে পারি যে, গীতার কর্মযোগ ও কান্টের নীতিতত্ত্বকে একই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করা অনুচিত, তবে উভয়ই নিজ নিজ স্থানে স্বমহিমায় উজ্জ্বল এবং বিশ্বের জনমানসে আন্তরিকভাবেই বন্দিত।

তথ্যসূত্র:

1) শ্রীমদ্ভগবদগীতা- ২/৪৭।

2) তদেব- ২/৪৮।

3) তদেব- ৩/৯।

4) তদেব - ৩/৫।

5) তদেব - ৩/২০

6) তদেব - ৩/৩০।

7) শ্রীমদ্ভগবদগীতা, শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ, পৃষ্ঠা- ১১৬-১১৭।

8) শ্রীমদ্ভগবদগীতা, স্বামী রামসুখ দাস, পৃষ্ঠা- ১১৬।

9) Groundwork of the Metaphysics of Morals, Kant, Translated and analyzed by H. J. Paton, Harper and Row, page- 61.

10) Ibid, page- 85.

11) Ibid, page- 96.

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

1) গোয়েন্দকা, জয়দয়াল, শ্রীমদ্ভগবদগীতা, (বাংলা) গীতা প্রেস, গোরখপুর, ২০১৫।

2) ঘোষ, জগদীশচন্দ্র (সম্পাদিত), শ্রীমদ্ভগবদগীতা, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১১৯২।

3) ঘোষ, অরবিন্দ, গীতানিবন্ধ, সর্বোসেবক সংঘ, কলকাতা,২০০০।

4) জগদানন্দ, স্বামী, (সম্পাদিত), শ্রীমদ্ভগবদগীতা, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা ১১৯১।

5) দাস, রাসবিহারী, কান্টের দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৭৯।

6) Kant, Immanuel, Ground work of the Metaphysics of Morals, Translated and analyzed by H. J. Paton, Harper and Row, London, 1964.

7) Paton, H.J., The Categorical Imperative, A study in Kant's Moral Philosophy, Hutchinson's University Library, 47prances Gate, London, 1946.

8) গুপ্ত, দীক্ষিত, নীতিশাস্ত্র, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৭।

9) Kant, Immanuel, Groundwork of the Metaphysics of morals, Translated and Edited by Mary Gregor, with Introduction by Christine M. Korsgaard, Cambridge University press,1785.

10) চক্রবর্তী, সোমনাথ, কথায় কর্মে এথিক্স, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০২।

11) Radhakrishnan, The Bhagavad Gita, London, Allen and Unwin, 1971.

12) বিবেকানন্দ, স্বামী, কর্মযোগ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০১।